জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন (National Education Movement)

● **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংজ্ঞা ঃ** সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইরেজ সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাতে কিন্তু জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলব তাকে, যে শিক্ষার মূল শিকড় জাতির ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত, যার উৎস হল জাতীয় জীবন রস, যে শিক্ষা সমগ্র দেশবাসীর সর্বাত্মক উন্নতি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ ঘটায়, দেশবাসীর কর্মধারাকে দিকে দিকে প্রসারিত করে, যে শিক্ষা সর্বপ্রকার চাহিদা পূরণের যোগ্যতা দান করে জাতিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলে, যে শিক্ষায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, যে শিক্ষা জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, যে শিক্ষা জাতির রীতিনীতি আচার মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও কল্যাণকর জীবন দর্শন অর্জনে সাহায্য করে, যে শিক্ষা জাতির অতীত সংস্কৃতি ও ভবিষ্যৎ প্রগতির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে, যে শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগিয়ে তোলে।

● **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ(Causes of national Education Movement)ঃ** ইংরেজদের এদেশে আসবার আগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রামকেন্দ্রিক ছিল, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ছিল নাড়ীর যোগ।

☐ (১) কিন্তু ইংরেজ সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তাতে জাতীয় শিক্ষার দাবী অবহেলিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতবাসী নিজের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভুলতে বসেছিল। জাতীয় জীবন সংস্কৃতির মান দিনে দিনে নিম্নগামী হয়ে পড়ছিল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্য দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছিল। সেজন্য শিক্ষা নায়করা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

☐ (২) ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যখন চাইলেন শিক্ষার সাহায্যে চিন্তা ও কর্মে স্বাধীন মানুষ তৈরি করতে, ইংরেজ শাসকরা তখন বাণিজ্য ও শাসন কার্যের সুবিধার জন্য একদল কেরাণী তৈরি করতে ও একদল বৃটিশ রাজভক্ত প্রজা সৃষ্টি করতে, উচ্চবর্ণ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইলেন।

☐ (৩) ভারতের ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই বৃটিশ শাসক ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষাই পরোক্ষ ভাবে ইউরোপীয় উদারনৈতিক যুক্তিবাদী ভাবধারায় ভারতীয় জনমনকে সিঞ্চিত করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার প্রেরণা যোগায়।

☐ (৪) ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় গণশিক্ষার অতি সামান্য আয়োজনই ছিল। গণশিক্ষাকে অবহেলা করে উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করাই

2023 08 18 13:10

ছিল সরকারী শিক্ষানীতি।

□ (৫) ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তা ছিল প্রধানতঃ পুঁথিগত।

□ (৬) ব্যবহারিক শিক্ষার স্থান ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায় অবহেলিত ছিল।

□ (৭) মুষ্টিমেয় কিছু লোক উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম কিন্তু সমাজের অগণিত লোক স্বাধীন শিক্ষার আলোক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।

□ (৮) বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যখন ইংরেজ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত, তখন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে লর্ড কার্জন আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা সংকোচনের নীতি গ্রহণ করেন। কার্জনের শিক্ষা সংকোচনের নীতি ভারতবাসীর অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছিল। ভারতের জনমত কার্জনের ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা আইনের তীব্র নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদ তখন একটি বিদ্রোহী আকার ধারণ করেছিল। ভারতীয়দের শিক্ষা সংক্রান্ত বিক্ষোভে অগ্নি সংযোগ করল লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ও ভারতীয় স্বার্থ বিরোধী ঔপনিবেশিক নীতি। ১৯০২ খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জন যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেছিলেন এতে প্রথমে কোন ভারতীয় সদস্য ছিলেন না। আন্দোলনের চাপে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই কমিশন উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করেন।

□ (৯) কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করল। বঙ্গভঙ্গের ফলে স্বদেশী নেতৃবৃন্দ আন্দোলন শুরু করলেন। কার্জনের দমন নীতি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আশু কারণ হিসাবে গণ্য হল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী নেতৃবৃন্দ স্বদেশী আন্দোলন শুরু করলেন। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করবার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, সে আন্দোলনে দেশের ছাত্ররাও দলে দলে যোগ দেয়।

□ (১০) পুনরুজ্জীবন (Revivalism) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি অন্যতম কারণ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরাধীন জাতির মুক্তি আন্দোলন কালে এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদ ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার দিকে লক্ষ্য দিলেন, প্রাচীন গৌরবের মধ্যে সান্ত্বনা পেতে চাইলেন এবং প্রাচীন আদর্শের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখলেন।

জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংরেজের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে নিজেদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী হলেন। অনেক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সব বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে গণশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সমান তালে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এগিয়ে চলে।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় (১৯০৫-০৬ খৃঃ) (First Phase of National Education Movement)

National Education Movement of 1905-06 : জাতীয় নেতৃবৃন্দ ইংরেজের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে এক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনাদর্শ তথা শিক্ষা সংগঠনের প্রয়াস করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দ্রাবাদে বৃন্দাবন গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে কাংড়া গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ইঙ্গ -বৈদিক কলেজ স্থাপন করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেদাবাদ কংগ্রেসে সরকারী শিক্ষানীতি তীব্র সমালোচনা করেন।

জাতীয় শিক্ষা, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন — জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল বাংলাদেশ। লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে পঙ্গু করবার জন্য বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করেন (১৯০৫ খৃঃ)। দেশব্যাপী প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয়। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা যেন বারুদ স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করল। জাতীয়তাবাদী নেতারা বুঝলেন যে বঙ্গবিভাগের আসল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সংহতি নষ্ট করা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেওয়া। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে নেতৃবৃন্দ স্বদেশী আন্দোলন ঘোষণা করলেন। দলে দলে শিক্ষক, ছাত্র স্কুল ও কলেজ ত্যাগ করল। বয়কট হল ত্রি-ধারায় (ক) ইংরেজের আদালতে না যাওয়া (খ) সরকারী স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করা, (গ) বিলেতী জিনিস ব্যবহার না করা এবং বিক্রির বিরুদ্ধে পিকেটিং করা। রজনীকান্ত গাইলেন —

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।।"

চারণ কবি মুকুন্দ দাস গাইলেন -

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পরোনা।"

কবি রবীন্দ্রনাথ গাইলেন-

"বাংলা মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।"

আন্দোলনের যখন ধ্বনি হল ত্রি-ধারায় বয়কট এবং স্বদেশী, তখন সরকারের নীতি হল দমন, পীড়ন। জনসভা এবং বয়কটে ছাত্রদের যোগ দেবার বিরুদ্ধে জারি হল কার্লাইল সার্কুলার। এই সার্কুলারের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র সমাজকে দূরে রাখা। স্কুল, কলেজ বর্জনকারী ছাত্রদের উপর সরকারী পীড়ন যন্ত্র নেমে এল।

ডন সোসাইটি ও সতীশচন্দ্র ঃ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাসাধক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রভাগে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ছাত্রদের জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য নিরলসভাবে কাজ করতে থাকেন। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভাগবত চতুষ্পাঠী নামে ভবানীপুর অঞ্চলে একটি টোল খোলেন। এই চতুষ্পাঠীর মুখপাত্র ছিলেন ডন (Dawn) পত্রিকা। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকায় নামানুসারে ডন সোসাইটি (Dawn Society) স্থাপন করেন। বাংলাদেশে সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল এই সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ডন সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

● **জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education)** ঃ স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি বিদেশী শিক্ষার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন প্রত্যক্ষ ভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম আন্দোলন গড়ে উঠে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়ণ করার তীব্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ১৯০৫ সালের ৮ই নভেম্বর তিনশত ছাত্র নিয়ে রংপুর জেলায় প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হল। ৯ই নভেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবের উদ্যোগে সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করার কথা ঘোষণা করেন। ১৬ই নভেম্বর বঙ্গীয় জমিদার সভার বাড়ীতে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি নাগরিক সভা আহুত হয়। এই সভাতে বাঙালীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সকল নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় যে প্রস্তাব পাশ হয় তাতে উল্লিখিত ছিল যে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা পর্যদ গঠন করা হবে। এখানে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। জাতীয় ভাবধারায় এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এই সভাতে একটি প্রাদেশিক কমিটিও গঠিত হয়েছিল। কমিটির ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ চৌধুরী, ব্রজেন শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি।

১৯০৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় — "দেশের তাবৎ ছেলেমেয়েদের জন্য এমন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা দরকার, যার মধ্যে থাকবে প্রয়োজন ভিত্তিক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা"। এই শিক্ষা ব্যবস্থা হবে জাতীয় ধারায় সঞ্জীবিত, জাতীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ও জাতীয় ভাগ্য নির্ধারণের লক্ষ্যে স্থিরীকৃত।

এ সময় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রভাগে এসে দাঁড়ালেন ডন

সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ডন সোসাইটির নেতা এবং কর্মীরা সাংগঠনিক কাজে নিজেদের নিয়োগ করলেন। আবেগ তাড়িত যুক্তি সম্মত চিন্তা ভাবনার সাহায্যে জাতীয় শিক্ষার দাবী কার্যকর করার জন্য স্থায়ী সমাধানের পথ ও গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা করলেন। ১৯০৬ সালের ১৬ই মার্চ সতীশচন্দ্রের ডন সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) -এ পরিণত হল।

১৯০৬ সালের ৪ঠা আগস্ট টাউন হলে বাংলার মনীষীরা মিলিত হলেন। সবার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত Bengal National College and School -এর উদ্বোধন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষ হলেন বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ। প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী ও হীরেন্দ্র দত্ত। প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধন সভায় বক্তৃতা সম্বন্ধে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "নিজের দেশকে ভালবাসা নিশ্চয়ই গৌরবের। প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। তাই জাতীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয় একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে কেবল প্রাথমিক স্তরে নয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া না হচ্ছে",। সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অনবদ্য ভাষণে বলেন 'স্বদেশ আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই তার সর্বপ্রধান কর্মী। অনেকদিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পেল। আমাদের যে পাওয়ার ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায় আমরা তা বুঝলাম। আমরা যে বিদ্যালয়কে শুধু পেলাম তা নয়, আমরা নিজের শক্তিকে পেলাম"।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কারিগরী এই চার বিভাগে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ধার্য হল। এখানকার শিক্ষক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বিনয় সরকার প্রভৃতি। নিয়মিত ক্লাস ছাড়া জাতীয় কলেজে অতিরিক্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। রাসবিহারী ঘোষ; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, প্যারীমোহন মুখার্জী, বাল গঙ্গাধর তিলক, এ্যানি বাসান্ত প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ কলেজ পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠা দিবস, বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ, বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রদর্শনী প্রভৃতি নানা ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলেজের সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছিল।

● **জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ** সতীশচন্দ্রের ডন সোসাইটি শুরু হয় ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ। ডন সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে (National Council of Education) রূপান্তরিত হল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্তৃত্বে বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয় (National School) ও জাতীয় কলেজ (National College) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋষি অরবিন্দ হলেন জাতীয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র হলেন অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ, নিরানব্বই জন সদস্য এই পরিষদের মধ্যে ছিলেন; জাতীয়

শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিস্তৃত খসড়া তৈরী হয়। উচ্চতম শ্রেণী থেকে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত কোথায় কি পড়ানো হবে তা স্থির হয়। কলকাতায় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ (Bengal national College) স্থাপিত হয়, যাদবপুরে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়।

● **কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি ও বঙ্গীয় কারিগরী বিদ্যালয় ঃ** স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে Society for the Promotion of National Education in Bengal গঠিত হয়। ১৯০৬ সালে তারক নাথ পালিত প্রতিষ্ঠা করেন Society for the Promotion in Technical Education. এই সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত হল Bengal Technical Institute। মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার মধ্যেই কারিগরী বিদ্যালয়ের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। মাধ্যমিক স্তরে কেবল ব্যবহারিক ট্রেনিং দেওয়া হত। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য। এই স্তরে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও কেমিক্যাল শাখার তত্ত্ব ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়াও সেরামিক, ডাইং সাবান তৈরী, চামড়ার ট্যানিং, কারিগরী রসায়ণ প্রভৃতির শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম ভাগে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বিদেশী শিক্ষার পরিপূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ১৯০৭ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থী লোকদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অনুভব করেছিলেন যে অগণিত নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সার্থক হবে না। তাই তারা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ১৯১০ এবং ১৯১১ সালে পর পর দুটি প্রস্তাব তিনি রাজকীয় আইন সভায় পেশ করেন। কিন্তু রাজকীয় আইন সভায় তাঁর বিল বাতিল হয়। তা সত্ত্বেও মহামতি গোখলের প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে আর একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষার কর্মক্ষেত্রে রূপে বেছে নিয়ে দেশ সেবার কাজে লেগে গেলন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে তিনি পরপর চারবার উপাচার্য হন। তাঁরই প্রাণবন্ত নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত বিকাশ হয়েছিল। আশুতোষ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মূল ধারাকে বর্জন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ই হল তাঁর কর্ম এবং চেতনার তীর্থক্ষেত্র। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের এক এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছাপাখানা স্থাপন করলেন। দ্বারভাঙা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। প্রফেসর, রিডার, লেকচারার পদ সৃষ্টি হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি কলেজ স্থাপিত হল। ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে

আইন কলেজ স্থাপিত হল। আশুতোষ বললেন, "আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় হল জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার, এক বিরাট যজ্ঞশালা, চিন্তা ও কাজের মানুষ তৈরীর বিরাট কর্মক্ষেত্র।" তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলেন। আশুতোষের ধ্বনি ছিল "মাতৃভাষার চর্চা কর, মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে জনতার কাছে পৌঁছাও"।

১৯১৪ সালে পৃথিবী ব্যাপী মহাসমর উপস্থিত হয় এবং ১৯১৮ সালে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলস্বরূপ ভারতেও শিক্ষা প্রসারের কাজ ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব তখন বাংলা সরকারের উপর অর্থাৎ ভারতে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা পরিচালিত হবার আইন পাশ হল।

● **প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বা ব্যর্থতার কারণ ঃ** জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারাটি মূলতঃ স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় সঞ্জীবিত ছিল। তাই স্বদেশী আন্দোলনে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে এল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নতুন আদর্শ ও কর্ম পন্থার জন্য এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তবে আন্দোলনের কয়েকটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও ছিল।

● **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ব্যর্থতার পশ্চাতে অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান ছিল ঃ** (১) প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা আন্দোলন রাজনীতি নির্ভর ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে।

(২) এ আন্দোলনে ভাবাবেগ ছিল বেশী। তাই সহজেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

(৩) জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ছিল। জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ শিক্ষার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। শিক্ষার ব্যাপারে তিন দলের তিন রকম মতবাদ ছিল। এই তিনের মধ্যে যথাযোগ্য সমন্বয় স্থাপিত হয়নি।

(৪) হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের (Revivalism) প্রভাবের ফলে প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা আন্দোলনে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ অতি সীমিত ছিল।

(৫) প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন মূলতঃ বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(৬) স্কুল কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থাভাব দেখা দেয়। নিয়মিত অর্থ সংস্থানের অসুবিধা হয়। জনসাধারণের মধ্যেও উৎসাহের অভাব দেখা দেয়। ফলে কিছু কিছু জাতীয় বিদ্যালয় উঠে যায়।

(৭) জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনার জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত অথচ সুদক্ষ শিক্ষক সরবরাহের অসুবিধা ছিল।

(৮) জাতীয় বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় গৃহ সমস্যা ও সাজসরঞ্জামের

অসুবিধা ছিল।

(৯) ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ পরায়ণ হয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে সন্তান প্রেরণে অনেক অভিভাবক অনিচ্ছুক ছিলেন।

● **জাতীয় বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঃ** জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (Second Phase) - জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন (Non Co-operation Movement) দেশব্যাপী সাড়া জাগালো। স্কুল কলেজ, অফিস আদালত বর্জনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করে। বহু ছাত্র সরকারী স্কুল কলেজ ছেড়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাতীয় আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্রতর হয়। শুরু হয় দমন পীড়ন, অত্যাচার নির্যাতন। ভারতের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেই বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ উৎসাহ দিতে লাগলেন। এ আন্দেলেনের ফলে জাতীয় বিদ্যালয় নামে এক নূতন শ্রেণীর বিদ্যালয় গড়ে উঠল। কিছু কিছু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা দিল্লীতে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তাছাড়া বহু জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যথা- গুজরাট বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, বঙ্গীয় বিশ্ব বিদ্যালয় প্রভৃতি। এ সময় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে গড়ে ওঠে অনেক জাতীয় মেডিক্যাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, আর্ট স্কুল প্রভৃতি। জাতীয় বিদ্যালয়গুলির জন্য যে পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করা হয়েছিল সে সকল পাঠ্যসূচীতে জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় ইতিহাস, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী ভাষার প্রবর্তন, কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষা প্রভৃতি স্থান পেয়েছিল।

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পতনও ঘনিয়ে আসে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি কাল।

● **ফলশ্রুতি ঃ** তবে এই আন্দোলন জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। (১) ১৯২১ - ২২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতে ১২২৭ টি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৮,৫৭১ জন। ফলে সরকার অনুমোদিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পায়। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত গভীর, ব্যাপক শক্তিশালী, সর্বভারতীয় , সুচিন্তিত, যুক্তিনির্ভর ও সুপরিকল্পিত, (৩) মুসলিমদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। (৪) সর্বভারতে ইংরেজীর পরিবর্তে একটা জাতীয় ভাষা প্রবর্তনের জন্য বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। (৫) বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (৬) নারী শিক্ষার জন্য পৃথক পাঠ্যসূচী রচিত হয়। (৭) ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাসমূহ শিক্ষাসূচীতে

Shot on realme 9 5G

স্থান লাভ করে।

● **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় (Third Phase of National Education)ঃ** জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিবর্তে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টির প্রবণতা ছিল। এ স্তরে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হয়নি, বরং ভবিষ্যতে জাতীয় শিক্ষার রূপ নির্ণয়ের প্রয়াস হয়েছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ হবার পর কংগ্রেস ভারতের সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করতে সমর্থ হয়। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ সমূহে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। জাতীয় স্তরে জাতীয় স্বার্থে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। দেশের প্রাথমিব শিক্ষার প্রতি কংগ্রেস মন্ত্রীদের স্বভাবতই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কংগ্রেস প্রথম থেকেই ঘোষণা করে আসছিল যে শাসন ব্যবস্থা তাদের হাতে এলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা এই দরিদ্র শোষিত দেশের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

● **বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সংহত রূপ লাভ ঃ** কংগ্রেসী মন্ত্রীমন্ডলী যখন সংকটের সম্মুখীন, তখন জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে। দরিদ্র দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যখন কংগ্রেস নেতারা দিশাহারা, ঠিক সে সময় (১৯৩৭ খৃঃ হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর বৈপ্লবিক শিক্ষা পরিকল্পনা বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা (Basic Education) প্রকাশ পায়। তিনি গণশিক্ষার ও গণসাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরই পরিণত রূপ। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংহত রূপ (Concretisation of Concept of National Education) লাভ করে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ধাতে গান্ধীজী একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। ওয়ার্ধার নিকট সেবাগ্রামকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ। সকল শিক্ষার্থীর বাধ্যতামূলক সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষাকে অর্থের জন্য পিছিয়ে দিবার কোন প্রয়োজন নেই, শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক স্বনির্ভর (Self Supporting)। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে Surgent Report এ বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the National Education Movement)

ভারতের প্রথম পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে

(১) আন্দোলন প্রধানতঃ বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল।

(২) আন্দোলনের সূচনা কালে নেতৃবৃন্দের মধ্যে আদর্শগত স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব ছিল। নেতৃত্বের মধ্যে ছিল আদর্শগত বিরোধ।

(৩) এই শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ ভারতীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করা।

(৪) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতাগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান ও বৃত্তিগত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন।

(৫) প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

(৬) প্রথম পর্যায়ে আন্দোলনে আবেগ প্রবণতা ছিল।

● **দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঃ—**

(১) আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত গভীর, ব্যাপক ও সর্বভারতীয়।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে মুসলিমদের অংশ গ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

(৩) এই আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত সুচিন্তিত, যুক্তিনির্ভর সুপরিকল্পিকত ও স্বতঃস্ফূর্ত।

(৪) এই পর্বে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের স্বরূপ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

(৫) তৃতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য ছিল কর্মপ্রয়াসের পরিবর্তে ভাবপ্রয়াস, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিবর্তে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টির প্রবণতা।

শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল ছিল সুদূর প্রসারী।

(১) এই আন্দোলনের প্রচন্ড প্রভাব সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের উপর পড়েছিল। ইংরেজ প্রশাসক ও তাঁদের পরামর্শদাতাগণ বুঝেছিলেন, যে এই শিক্ষা আন্দোলন পুঞ্জীভূত অসন্তোষের আত্মপ্রকাশ। তাই অনেকে ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার

দোষত্রুটি সংশোধন করার পরামর্শ সরকারকে দিয়েছিলেন। ইংরেজ প্রবর্তিত ভারতীয় শিক্ষা পুঁথিভিত্তিক ও শিল্প প্রসারের অনুপযোগী ব্যবস্থা বলে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। ইংরেজ সরকার বুঝতে পারল যে, শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠন আশু প্রয়োজন।

(২) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজীর পরিবর্তে একটা জাতীয় ভাষা প্রবর্তনের জন্য বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

(৩) আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহ এবং প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সমূহের শিক্ষা সূচীতে স্থান করেনি।

(৪) এই আন্দোলনের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়।

(৫) নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে, নারী শিক্ষার জন্য পৃথক পাঠ্যসূচী রচিত হয়।

(৬) এই আন্দোলনের ফলে গণ শিক্ষার প্রয়োজীয়নতা স্বীকৃত হয়।

(৭) সাহিত্যমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(৮) প্রাক্‌স্নাতক স্তরে কারিগরি শিক্ষা উপজীবিকা ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হয়।

(৯) শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভারতীয়করণ দ্রুত অগ্রসর হয়।

(১০) এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা (জীবনভিত্তিক ও উৎপাদনভিত্তিক) পরিকল্পনার সূত্রপাত এ সময়েই হয়েছিল।

(১১) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার বিশেষ প্রচেষ্টা অনুভূত হয়। বরোদা রাজ্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে উত্থাপিত গোখেলে বিল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাদেশিক আইনসভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়।

(১২) বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধের পরিবেশ ও আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, জাতি সেবার মনোভাব ও জাতি গঠনের আদর্শ সৃষ্টি হয়।

(১৩) এ আন্দোলনের ফলে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনচিন্তার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, উচ্চতর প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়।

(১৪) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ভবিষ্যৎ জাতীয় চিন্তা - চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে পলিমাটি ছড়িয়ে দিয়েছিল। নূতন আদর্শ ও কর্ম পন্থার সূচক হিসাবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

(১৫) এই আন্দোলনের ফলে জাতীয় সমন্বয় ও সংহতি বৃদ্ধি পায়।

Shot on realme 9 5G